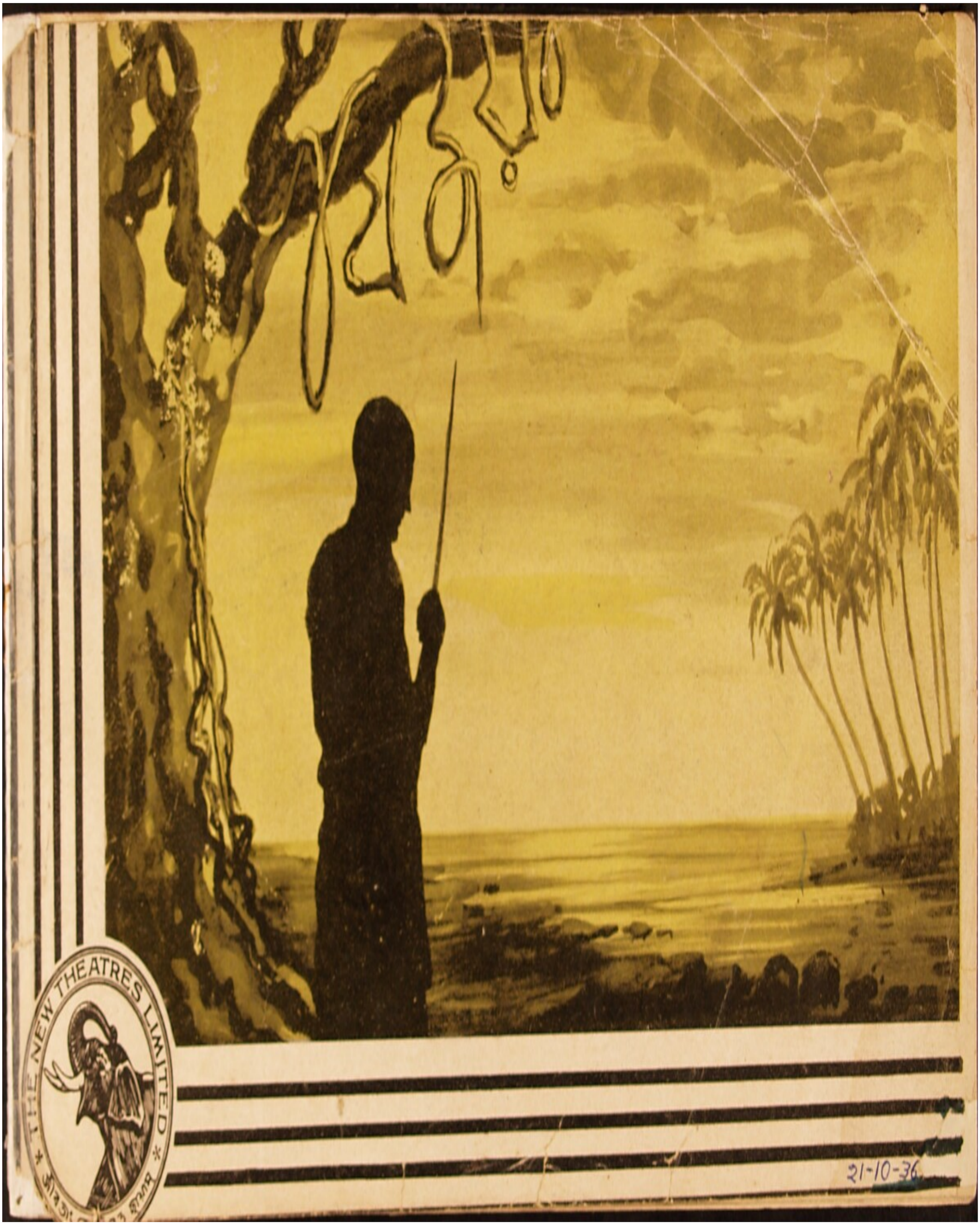
THE NEW THEATRES LIMITED
21-10-36

নিউথিয়েটার্সের প্রতি —

শরৎচন্দ্রের আশীর্ব্বাণী

“তোমরা আমার অনেক বই-ই চিত্রে রূপ
দিয়েছ। .... বিষয়ও ছবির দিক দিয়ে
.... সাহিত্যের দিক দিয়ে সকলের
মনোরঞ্জন করুক এবারেও আমি
এই আশীর্ব্বাদই করছি.....”

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

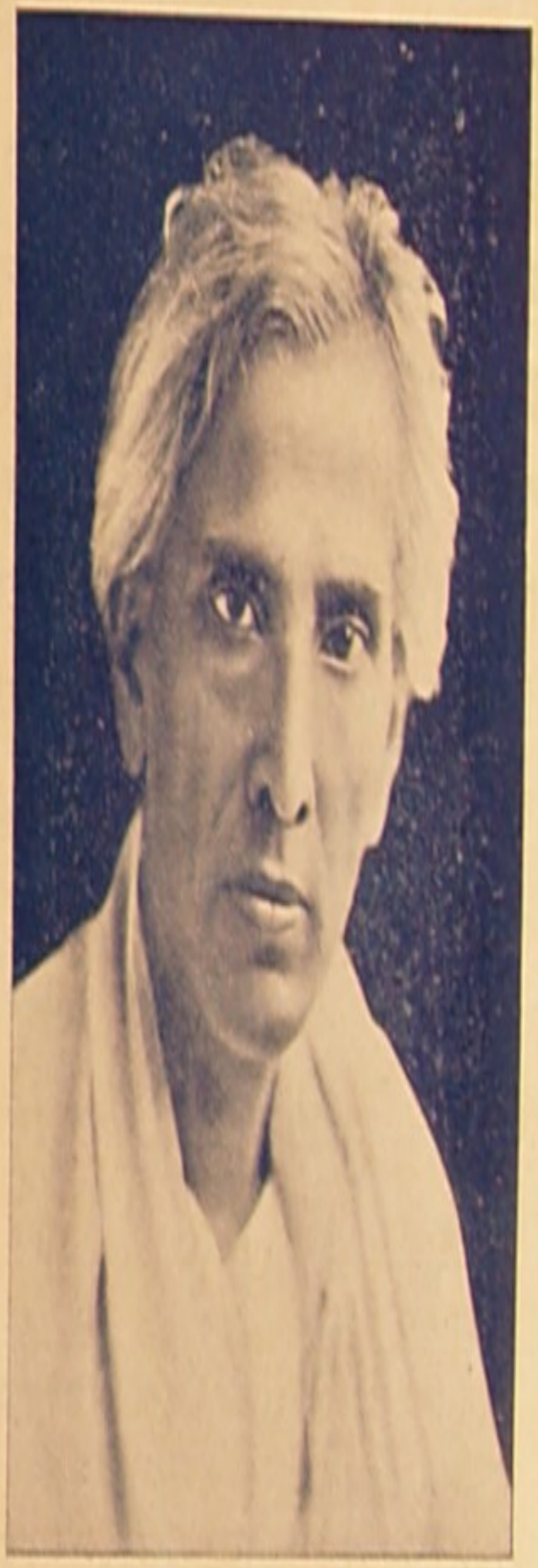

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

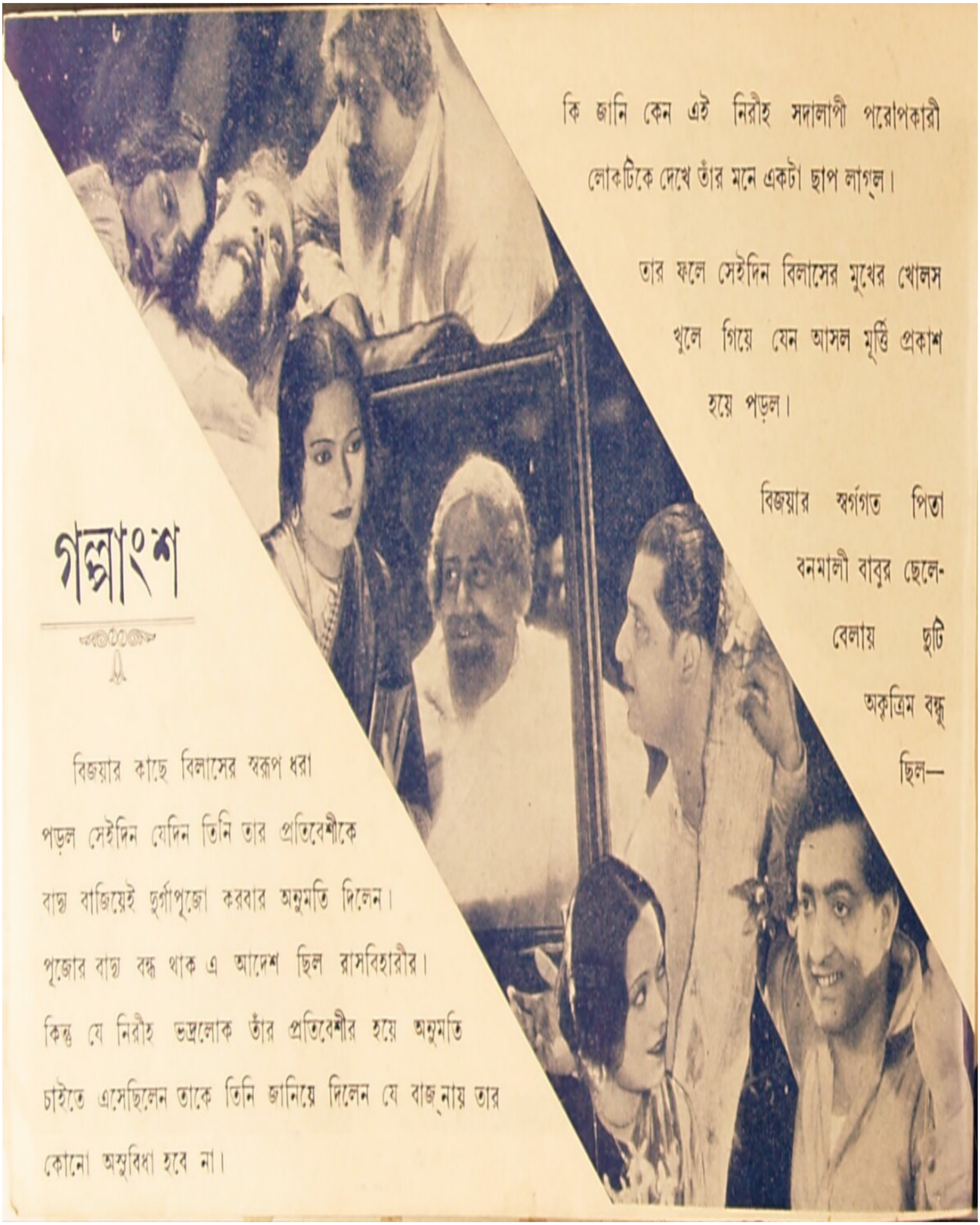

গল্পাংশ

বিজয়ার কাছে বিলাসের স্বরূপ ধরা পড়ল সেইদিন যেদিন তিনি তার প্রতিবেশীকে বাদ্য বাজিয়েই দুর্গাপূজো করবার অনুমতি দিলেন। পূজোর বাদ্য বন্ধ থাক এ আদেশ ছিল রাসবিহারীর। কিন্তু যে নিরীহ ভদ্রলোক তাঁর প্রতিবেশীর হয়ে অনুমতি চাইতে এসেছিলেন তাকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে বাজ্‌নায় তার কোনো অসুবিধা হবে না।

কি জানি কেন এই নিরীহ সদালাপী পরোপকারী লোকটিকে দেখে তাঁর মনে একটা ছাপ লাগ্‌ল।

তার ফলে সেইদিন বিলাসের মুখের খোলস খুলে গিয়ে যেন আসল মূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বিজয়ার স্বর্গগত পিতা বনমালী বাবুর ছেলে-বেলায় দুটি অকৃত্রিম বন্ধু ছিল—

জগদীশ ও রাসবিহারী। জগদীশবাবু শেষ-বয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন···কিন্তু তাঁর মন যে ছিল কত উঁচুতে—সে সন্ধান একমাত্র বনমালী বাবুই রাখতেন। জগদীশের একমাত্র পুত্র নরেনের জন্যেও তাঁর হৃদয়ে একটি স্নেহশীল-কোণ ছিল। তা' বাইরের হয়ত কেউই সন্ধান রাখ্‌তো না। পিতার মৃত্যুর পর বিজয়া তাঁর পিতৃবন্ধু রাসবিহারীর অভি-ভাবকতায় দেশের বাড়ীতেই এসে বাস করতে লাগলেন।

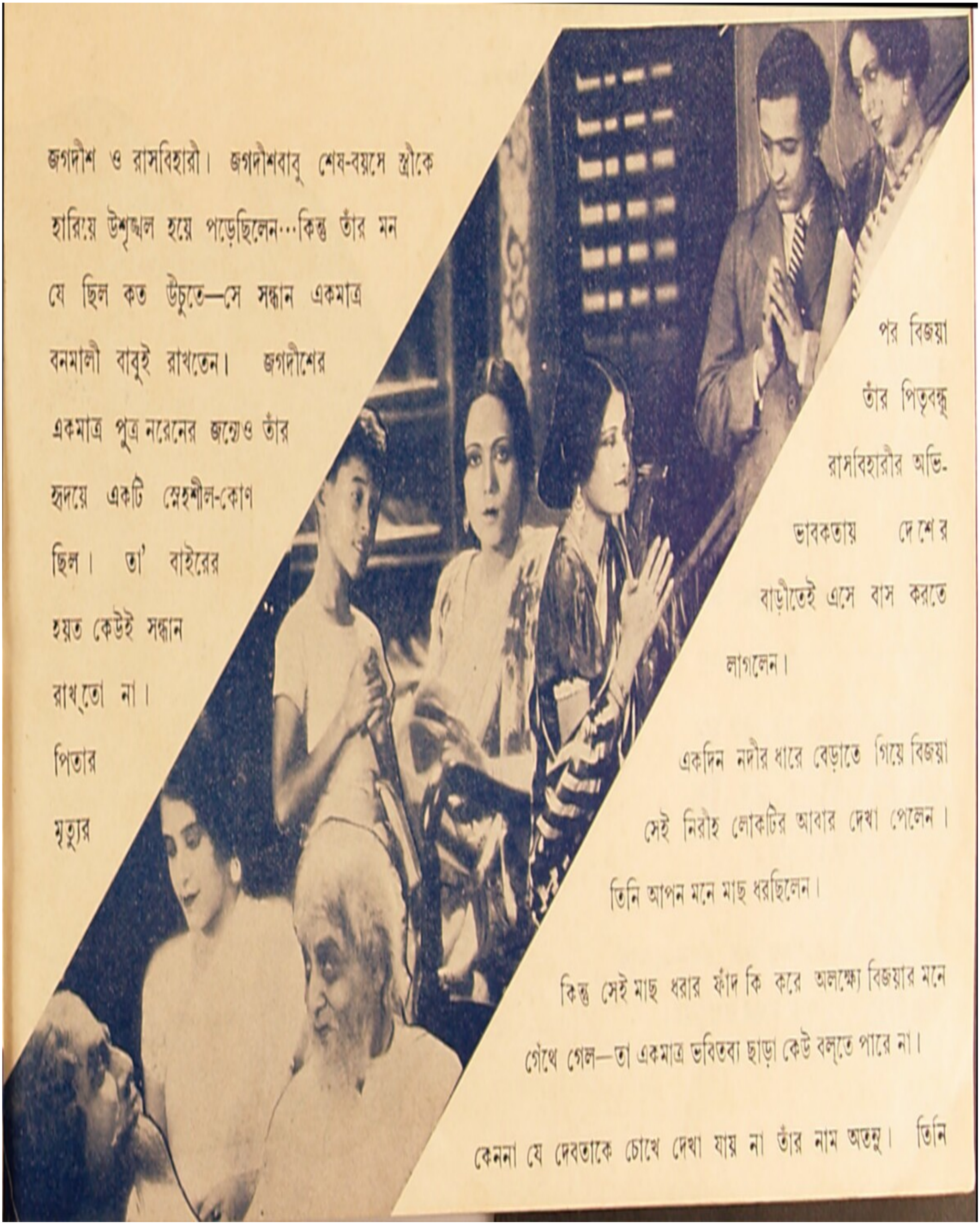

একদিন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে বিজয়া সেই নিরীহ লোকটির আবার দেখা পেলেন। তিনি আপন মনে মাছ ধরছিলেন।

কিন্তু সেই মাছ ধরার ফাঁদ কি করে অলক্ষ্যে বিজয়ার মনে গেঁথে গেল—তা একমাত্র ভবিতব্য ছাড়া কেউ বল্‌তে পারে না।

কেননা যে দেবতাকে চোখে দেখা যায় না তাঁর নাম অতনু। তিনি

ভেতরে ভেতরে বিজয়ার মনকে কোন কোন পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন—কে জানে!

রাসবিহারীর নজর ছিল—বিজয়ার সম্পত্তির দিকে। কাজেই তিনি স্থির করেছিলেন—নিজের একমাত্র পুত্র বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে দিয়ে বনমালীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করবেন।

বিজয়া বয়েসে তরুণী হলেও পিতার কাছ থেকে সতীকারের শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই রাসবিহারী কাজটাকে যত সহজ মনে করেছিলেন···কার্য্যক্ষেত্রে নেমে ঠিক ততটা সোজা বলে মনে হ'ল না।

প্রথমেই মনোমালিন্য সুরু হ'ল—নরেনকে তার পৈতৃক বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা নিয়ে।

বিজয়া তাঁর স্বর্গগত পিতার কথা মনে করে মানুষের স্বভাব-জাত কোমল-প্রবৃত্তি থেকে বলেছিলেন—আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু হঠাৎ তিনি খবর পেলেন…নরেনকে বাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে—

তিনি কোথায় চলে গেছেন !

তখন একদিকে পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে তাঁর মন যেমন বিষিয়ে উঠল—ঠিক তেমনি ওই গৃহহীন, আত্মীয়-স্বজন-হীন অনাড়ম্বর লোকটির জন্যে থেকে থেকে প্রাণ কাঁদতে লাগ্‌ল।

ধীরে ধীরে অপরিচয়ের গণ্ডীর ভেতর দিয়ে নরেন যে কখন এসে বিজয়ার তরুণী-মনে আসন পেতেছিলেন —হয়ত বিজয়া নিজেও তা বুঝতে পারলেন না।

একদিন এই নিরীহ ব্যক্তিটি তার মামার পূজোর

অনুমতি নিতে এসে সর্বপ্রথম বিজয়ার চোখে প্রেমাঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—সে কাজল আর তাঁর নয়ন থেকে উঠলো না।

রাসবিহারী চতুর—

তিনি নানাভাবে এই কথাটাই গ্রামে রাষ্ট্র করে দিয়েছিলেন যে একদিন বিলাস আর বিজয়ার দু'হাত এক হয়ে যাবে। আর সে দিনেরও খুব দেরী নেই।

এই সময় নরেন তার শেষ-সম্বল এক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিক্রয় করে বিদেশে চলে যাবার চেষ্টায় ছিলেন...। বিজয়া সেইটি নরেনের স্মৃতি-বিজড়িত বলে আঁকড়ে ধরলেন।

এই যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করে...বিজয়ার প্রেম নরেনের প্রতি যেমন গভীর হয়ে উঠল—ঠিক তেমনি ঝড়ের সৃষ্টি করল রাসবিহারী আর বিলাসের সঙ্গে।

পিতা-পুত্র চান না, নরেন এ ভাবে যখন-তখন এসে বিজয়ার সঙ্গে মেলামেশা করে...তার রোগে সে চিকিৎসা করে...তার ত্রিসীমানায় সে পা দেয়।

প্রেমের সূক্ষ্ম ব্যাপার সম্পর্কে নরেন একেবারে অজ্ঞ—তাই বিজয়ার সত্যিকারের মন তার কাছে অজানাই রয়ে গেল।

ঠিক এই সময় এই আখ্যায়িকার ভেতর আর একটি মেয়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মন্দিরের আচার্য্য দয়ালের ভাগ্নি নলিনী।

নলিনীর চোখেই সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ল বিজয়ার মন কোথায় বাঁধা পড়েছে !

কিন্তু ভুল বুঝ্‌ল বিজয়া। তাঁর মনে হল···নরেনকে যদি কেউ আকর্ষণ করে থাকে ত সে বিজয়া নয়—সে নলিনী ·· ।

এদিকে রাসবিহারী তাঁর স্বভাব-জাত চাতুরীতে ঘোষণা করে দিলেন—বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে একেবারে স্থির। এমন কি একদিন আশীর্ব্বাদও হয়ে গেল !

কিন্তু বাইরে জানা-জানি হ'লেও মনে-মনে চল্‌লো অন্তর্দ্বন্দ্ব।

সন্দেহ দোলায় দুল্‌ছেন—

রাসবিহারী—

বিলাস—

নরেন—

বিজয়া—

ঠিক এমনি সময়ে একদিন মন্দিরের আচার্য্য দয়াল সবাইকে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বস্‌লেন !

সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সবাই আস্‌ছেন—এমন কি রাসবিহারী পর্য্যন্ত !

নিমন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি—আমরা বসে বসে শুধু তাই-ই ভাব্‌ছি !

এক

বৈরাগীর গান—

এতদিন মা ছিলি ঘুমে এবার বুঝি ফিরলি ঘরে।
ও তোর রাঙা চরণ পাতে র'বে ফুটে কমল থরে থরে।
হেরিয়া তোর চাঁদের সিঁদুর
লাজেতে যে পালায় সুদূর,
আজ প্রভাতের অরুণ রবি সিঁদুর হয়ে ললাট 'পরে।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

দুই

মাঝির গান—

মন-পবনের ডিঙা বাইয়া বন্ধুর দেশে যাই।
দিনি সুতার মালা দিব তারে যদি পাই।
ওঠে ঝড়ে উথাল্
ছলকে ওঠে কালো জল,
আমি বন্ধুর নামে দিব পাড়ি ভয় যে কিছু নাই।

—সায়গল

তিন

নরেনের গান—

দিন্ দেশেরই রাজার কুমার তেপান্তরের মাঠে
কার লাগি সে আপনমনে বিজন পথে হাঁটে।

—পাহাড়ী সান্যাল

চার

নলিনীর গান—

আমার কামনা দুটি কুসুম হইয়া জাগে।
কপোলে রাঙিমা লাগে অজানার অনুরাগে।
আমার পরাণখানি
খুঁজে নাহি পায় বাণী
শুধু যে প্রণতি হয়ে কাহার চরণ মাগে।

—ভারতী

পাঁচ

বিজয়ার গান—

গানের বীণাটি তব মোরে দিয়ে গেলে হায় ।
ব'লে তো গেলেনা প্রিয় কি সুর জাগাব তায় ॥
সে কোন পরশ দানে
প্রদীপ জেলেছ প্রাণে
সে আলো নেভেনি আজও খুঁজিয়া মরে তোমায় ॥

—চন্দ্রাবতী

ছয়

নরেনের গান—

আমি গান গেয়ে যাই অকারণে ।
নাহি জানি আমার সুরে দেখা হবে কাহার সনে ॥
মুকুল যেমন কাননপারে
সুবাস বিলায় অজানারে
তেমনি আমার মনের কথা ভাসিয়ে দিলাম সমীরণে ॥

—পাহাড়ী সান্যাল

সাত

বিজয়ার গান—

অভিমানের বদলে হায় কি পেলি তুই দান ?
বেদনাতে শুধু যেরে উঠ্‌ল ভ'রে প্রাণ ॥
চাঁদের আলো ছিল যেথা
আঁধার ডেকে আনলি সেথা
আপন হাতে ভাঙ্‌লি বীণা শেষ না হ'তে গান !

—চন্দ্রাবতী

আট

নলিনীর গান—

বিবাগী পথিক-জনে আনিলে ফিরায়ে ঘরে।
আঁচলে বাঁধিলে তুমি বাঁধনহারা সে ঝড়ে ॥

* * * *

ছিঁড়িবে বলিয়া সখী যে-মালা লইলে হাতে,
কখন সে-ফুলহার জড়ালে পরাণ সাথে।

* * * *

বৃথা অভিমানে সখী ভেসেছিলে আঁখিজলে,
আজি সে অশ্রুতলে হাসির মাণিক-জ্বলে।

—আরতি

কাল কৃপালানীতে আমার বিজয়ার চিত্রাভিনয় দেখে এলাম। শ্রীমান অমর মল্লিকের রাসবিহারী অত্যন্ত ভাল লাগলো। মনে হলো যেটিকে এমনি রাসবিহারী চরিত্র আঁকবার সময়, কল্পনায় ~~সেদিন মানসে~~ চরিত্র করেছিলাম। এবং বিজয়ার নাট্য ও চিত্র উপন্যাস দুটিই যাঁরা লাগিয়েছেন তাতে এঁদের অভিনেতাদির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। নীতিন বসু মহাশয় সম্বন্ধে আনন্দ করবার এক বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া ~~[illegible]~~ গেল যে বহু লোকেরই এঁরা প্রীতি ও সম্মান লাভ করেছেন। আমার অনেক গল্পই নিউ থিয়েটার্স কোম্পানির হাতে দশের কাছে উচ্চ খ্যাতি লাভ করেছে সুতরাং, এ আশাও রাখি যে এ ছবিখানিও ~~[illegible]~~ তাঁদের তেমনি আসনেই অব্যাহত থাকবে। ইতি ২০শে কার্তিক ১৩৪৩ ॥

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়